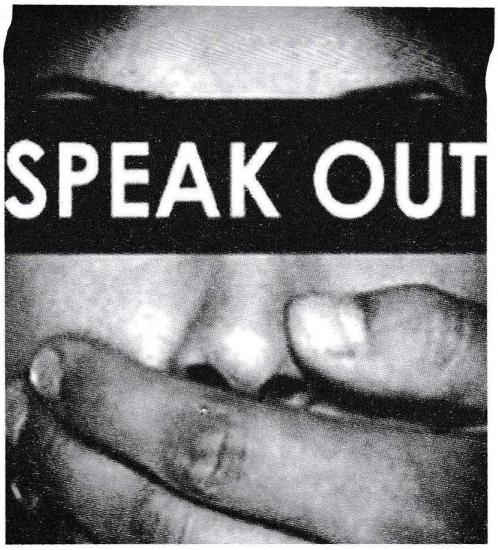

ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন
মেয়েরা কি নিজ ঘরে নিরাপদ?

সম্প্রতি দিল্লিতে 'দামিনা' ও টাঙ্গাইলে এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করার ঘটনা আমাদের সমাজকে বেশ নাড়া দিয়েছে। পত্র-পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি ও আলোচনা হচ্ছে। ধর্ষণের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়েছে দেখে আমরা কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হতে চাই যে সরকার এই অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর নতুন আইন করবে ও অপরাধীর শাস্তির জন্য ত্বরিৎ পদক্ষেপ নেবে। তবে, ঘরের বাইরে যতো না, ঘরের ভিতরে মেয়েরা যৌন নির্যাতনের শিকার হন অনেক বেশি। বাইরের ঐ পাষণ্ড পুরুষদের বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই সোচ্চার হবো। তবে, 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'-এর মতো ঘরে যেসব নরপশু রয়েছে তাদের ব্যপারে আমরা কতটুকু সচেতন? আমাদের পেশাগত জীবনে দেখি, মনোসমস্যা, মনোরোগ, যৌনসমস্যা, দাম্পত্য সমস্যা, বিষণ্নতা, নিজেকে আঘাত করা, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যার চেষ্টা বা আত্মহত্যা করা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা নিয়ে যেসব নারী চেম্বারে আসেন, তাদের অধিকাংশের শৈশবে বা কৈশোরে বেদনাদায়ক ও নিষ্ঠুর যৌন নির্যাতনের ইতিহাস রয়েছে। তাদের প্রায় ২০-৫০% শৈশব বা কৈশোরের শুরুতে তেমন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বলে স্বীকার করেন (পিটার ১৯৮৬)। ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের দুই-তৃতীয়াংশই ঘটে বাড়িতে - ৩০% অপরাধীর বাড়িতে, ২৭% নির্যাতিত নারীর বাড়িতে, ১০% উভয়ের পরিচিত বাড়িতে, ৭% পার্টিতে, ২% বারে। কেবল ৪% ধর্ষণ ঘটে বাইরে। আর যৌন নির্যাতনের সিংহভাগ ঘটে মেয়েদের নিজ বাড়িতে। তাই, নিজ ঘরে কন্যাসন্তান, বোন নিরাপদ রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে আমাদের অনেক বেশি সচেতন হতে হবে।

মনোসমস্যা, মনোরোগ, যৌনসমস্যা, দাম্পত্য সমস্যা, বিষণ্নতা, নিজেকে আঘাত করা, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যার চেষ্টা বা আত্মহত্যা করা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা নিয়ে যেসব নারী চেম্বারে আসেন, তাদের অধিকাংশের শৈশবে বা কৈশোরে বেদনাদায়ক ও নিষ্ঠুর যৌন নির্যাতনের ইতিহাস রয়েছে।

আমি-ই কেন?

১৭-১৮ বছরের মেয়েটিকে তার বড় বোন নিয়ে এসেছিল বেশ কিছু আবেগগত ও আচরণিক সমস্যার জন্য। বিশেষ করে অপরিচিত পুরুষ ঘরে আসলেই সে ভীত হতো, তারা কোন ক্ষতি করবে - এই সন্দেহ তার মনে আসতো। তাকে কয়েকটি সাইকোথেরাপি সেশন দেওয়ার পর, হজ করতে সৌদি আরবে যাওয়ায় সেশনে কিছুটা ছেদ পড়ে। ফিরে আসার পর মেয়েটি জানায়, অপরিচিত লোকের প্রতি তার সন্দেহ ও অবিশ্বাস আরো বেড়ে গেছে। তার সন্দেহ এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যে, তার ইচ্ছে হয় হাতে দা-ছুরি কিছু নিয়ে তৈরি থাকতে, যাতে সে সময়মতন প্রতিরোধ করতে পারে। যদিও সে স্বীকার করে যে, এরকম অবিশ্বাস করার বাস্তব কোন কারণ নেই, কিন্তু তবু তার মনে হয়, এটি সত্যি এবং সে সব সময় এ নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। সাইকোথেরাপি সেশনের এক পর্যায়ে সে কাঁদো-কাঁদো মুখে হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করে দেয়। তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'তোমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। লজ্জা পাওয়ারও কারণ নেই। কিছু গোপন কথা বলার থাকলে বলে ফেলো, তাতে তোমার মন হালকা হবে।' সে শৈশব থেকে শুরু করে প্রথম কৈশোর পর্যন্ত উপর্যুপরি বেশ কয়েকটি নরপশুর দ্বারা তার ওপর যৌন নির্যাতনের কথা বিস্তারিতভাবে বললো। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলার পর, নিজের প্রতি ক্ষোভ ও আক্ষেপের সঙ্গে সে আমার দিকে এ কথাটি ছুঁড়ে মারলো, 'আমি-ই কেন?'

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এরকম নোংরা ঘটনার জন্য নির্যাতিত মেয়েদের অনেকেই নিজেদের ছোট, হীন, অপমানিত, অসম্মানিত ভাবে। নিজেকে ও নিজের শরীরকে শ্রদ্ধা করার বদলে, সেটিকে নোংরা ও কলুষিত ভাবে এবং নিজেকে দোষারোপ করে। ভাবে, আমার ভিতর নিশ্চয়ই কিছু দোষ-ত্রুটি রয়েছে, তা না হলে এসব নরপিশাচের শিকার বার বার 'আমি-ই কেন হবো'? এই মেয়ের মতন শৈশব-কৈশোরে যারা নিজের ঘরে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তাদের নির্যাতনকারীরা দুলাভাই, টিউটর, মামা, চাচা, সৎ বাবা-জাতীয় পরিচিত জন, যাদের ঘরে থাকে অবাধ প্রবেশাধিকার।

দুলাভাই কর্তৃক যৌন নির্যাতনের শিকার এক মেয়ের পরিবারের লোকেরা যখন সেটি নিয়ে কানা-ঘুষা করছিলো তখন সেই নির্যাতিত মেয়ের বাবা সবাইকে বলেন, 'এ নিয়ে এতো মাতামাতি করার কী আছে? আমরাও শালীদের সঙ্গে এরকম ঠাট্টা-মস্করা করেছি। ঘটনাটি নির্যাতিতার বড়বোনকে (ঐ দুলাভাইয়ের বউ) জানানোর কথা উঠলে, তাদের এক মামা বলেন, 'এটা ঠিক হবে না। তাহলে ঐ মেয়েটির জীবনও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।' এভাবেই ঘটনাটিকে ধামা-চাপা দেওয়া হয়। এই যদি হয় পরিবার বা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি তাহলে সেই বিকৃতমনা পশুদের উৎসাহ বাড়াটাই স্বাভাবিক। পরিবার ও সমাজ থেকে এরকম প্রতিক্রিয়া পাবে জেনেই বেশিরভাগ নির্যাতিত মেয়ে সে ঘটনা কারো কাছে খুলে বলতে সাহস পায় না। প্রথমে যে মেয়েটির কথা উল্লেখ করেছি, দীর্ঘ ১০ বছর পর এই প্রথমবার সে কারো কাছে তার সেই গ্লানিময়, যন্ত্রণাময় ঘটনার কথা খুলে বললো।

কীভাবে যৌন নির্যাতন অনুমান করা যায়

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের দেশে মেয়েরা ভয়ে ও লজ্জায় যৌন নির্যাতনের ঘটনা পরিবারের কাউকে জানাতে চায় না। তাই আমাদের, বিশেষ করে মায়েদের, কন্যা-সন্তানের সঙ্গে আরেকটু সহজ, খোলামেলা হতে হবে। তাদের সাথে ভালো-মন্দ সব ব্যাপারে অকপট যোগাযোগ রাখতে হবে। এরকম হলে, অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে নিজেই হয়তো সরাসরি তার দুর্গতির কথা জানাবে। যদি নাও জানায়, কিছু পরোক্ষ লক্ষণ দেখে এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন। যেমন, ঘরের কোন বিশেষ মেয়ের প্রতি পুরুষের অতিরিক্ত আদর, বেশি স্নেহ করা, বেশি কাছে টেনে নেওয়া, বিশেষ উপহার দেওয়া বা তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে আগ্রহ দেখানো। ঘটনা ঘটে গেলে, মেয়েটির কিছু শারীরিক সমস্যা (যেমন, যৌনাঙ্গে বা পায়ুপথে সমস্যা) দেখা দিলে, আবেগগত বা আচরণগত সমস্যা (যেমন, অপরিপক্ক যৌন আগ্রহ বা পুরুষদের প্রতি লজ্জা কেটে গিয়ে আকর্ষণ ও আগ্রহ) দেখা দিলে, ঘর থেকে পালিয়ে গেলে অথবা ব্যাখ্যাহীন কারণে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তেমন কিছু ঘটেছে কি না খুঁজে বের করতে হবে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

যৌন নির্যাতনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে উদ্বেগ, ভয়, আতঙ্ক, বিষণ্নতা, ক্রোধ, আগ্রাসী আচরণ, অপরাধবোধ ও ঘটনার জন্য নিজেকে দোষারোপ করা। তবে, নির্যাতনের মাত্রা বেশি হলে একিউট স্টেস ডিসঅর্ডার-এর লক্ষণ দেখা যায়, যার সাথে পি.টি.এস.ডি. (পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার) রোগেরও লক্ষণ থাকে। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন টাঙ্গাইলের সেই গণধর্ষিতা মেয়েটির মধ্যে এই দু' ধরনের লক্ষণই রয়েছে, যার জন্য তার স্বাভাবিক হতে বেশ সময় লাগছে। মহিলাদের পি.টি.এস.ডি. হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতন।

দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশি উদ্বেগজনক হচ্ছে যৌন নির্যাতনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব। এই দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া, বিশেষ করে শৈশবে যৌন নির্যাতনের প্রভাব, নারীকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়। শৈশবের যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি, দুর্ঘটনা বা অপ্রীতিকর ঘটনা শিশুর মন ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। আর সেটি যদি হয় ধর্ষণের মতো নারকীয়, ভয়াবহ ঘটনা তাহলে তার প্রভাব হয় আরো সুদূরপ্রসারী। পরবর্তী জীবনে উদ্ভূত তেমন কিছু সমস্যার মধ্যে রয়েছে বিষণ্নতা, আত্মসম্মানবোধ কম থাকা, অন্যদের সাথে (বিশেষ করে প্রিয়জনদের সাথে) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা, বিবাহিত জীবনে যৌন

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশি উদ্বেগজনক হচ্ছে যৌন নির্যাতনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব। এই দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া, বিশেষ করে শৈশবে যৌন নির্যাতনের প্রভাব, নারীকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়।

সমস্যা, নিজেকে আঘাত/আহত করার প্রবণতা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার চেষ্টা বা আত্মহত্যা করা। এছাড়াও, নিজেকে মন্দ ভাবা, দোষারোপ করার প্রবণতা, বিভিন্ন ভয়-ভীতি-আতঙ্ক, অন্যদের বিশ্বাস করতে না পারা, সামাজিক দক্ষতা কম থাকা, যৌন জীবনে অন্তরঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা, ঘুমের সমস্যা, খাওয়ার সমস্যা ও মনোযোগের সমস্যা।

পরবর্তী নির্যাতন

গ্লোবাল ফোরাম ফর হেলথ এ্যান্ড রিসার্চ এক রিপোর্টে জানায়, ধর্ষিতা বা যৌন নির্যাতিতা মেয়েদের ধর্ষণ বা নির্যাতনকারীদের সাথে বিয়ে দিলে ওই মেয়েদের ওপর পরবর্তীতে আরো নির্যাতন করা হয়। মরক্কোর ১৬ বছরের এক বালিকাকে ধর্ষণকারীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার পর, সে দেশের মানবাধিকার কর্মীরা এরকম আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেন। আমাদের দেশেও ধর্ষণ সমস্যার সহজ সামাজিক সমাধান হিসেবে ধর্ষকের সঙ্গেই মেয়েটিকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এমনকি কিছু দেশে (যেমন, পাকিস্তান) ধর্ষণের শিকার মেয়েটিকে 'অনার কিলিং'-এর নামে হত্যাও করা হয়। তাছাড়া, ধর্ষণের পর পুলিশের ও সংবাদকর্মীদের জেরা আর মা-বাবা-আত্মীয়দের কাছে থেকে লাঞ্ছনা পাওয়া তো আছেই। দুলাভাই কর্তৃক ধর্ষিতা যে মেয়েটির কথা বললাম তার আপন ভাই বিষয়টি জেনে মন্তব্য করে, 'এসবই বাহানা। এতোদিন কিছু জানলাম না, এখন একটি নিউজ ছড়িয়ে দিচ্ছে।' আমাদের সমাজ ও পরিবার, এমনকি অতি-নিকটাত্মীয়রাও, তাদের সাথে এরকম নিষ্ঠুর, আমানবিক আচরণ করে থাকে। সম্ভবতঃ, পরবর্তী নির্যাতনের ধরন আরো বেশি অপমানকর, অসহনীয় বলেই বেশিরভাগ মেয়েরা এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকার পথ বেছে নেয়।

পৃথিবীব্যাপী ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের হার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ভারতে ১৯৯০ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ধর্ষণের হার দ্বিগুণ হয়েছে। আমেরিকায় প্রতি ৬ জন নারীর ১ জন এবং কলেজগামী ছাত্রীদের এক-চতুর্থাংশ ধর্ষণের শিকার হয়। আমাদের দেশেও যৌন নির্যাতনের হার যে বাড়ছে তা পত্র-পত্রিকা খুললেই বুঝা যায়। তবে যেসব ঘটনা চোখে পড়ে না সেই নিজ ঘরের তথ্যও আমাদের জানতে হবে। নারী আজ ঘরে-বাইরে সর্বত্র অনিরাপদ। বাইরের নিরাপত্তার জন্য আন্দোলন করবো, দাবী জানাবো, তবে, একই সঙ্গে, নিজ ঘরও যেন হয় কন্যা-সন্তানের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, সেটি আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

ডা. মো. তাজুল ইসলাম
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, সহযোগী অধ্যাপক
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা